ধ্বনিতত্ত্ব ৪

মানুষ কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে। কথার মূলে আছে কতকগুলো ধ্বনি। বাকযন্ত্রের সহায়তায় ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে সেগুলো হল—ফুসফুস, স্বরতন্ত্রী, গলনালী, জিভ, তালু, মাড়ি, দাঁত, ঠোঁট, নাক ইত্যাদি। ফুসফুস থেকে বাতাস স্বরতন্ত্রী, মুখ বা নাকের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় জিভ, তালু, মাড়ি, দাঁত, ঠোঁট প্রভৃতিতে নানাভাবে বাধা পায় এবং তাতে বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

ধ্বনি ঃ মনের ভাব প্রকাশের জন্য মুখ থেকে যে শব্দ বের হয় তাকে ধ্বনি বলে। যে কোন প্রকার শব্দকে ধ্বনি বলে বিবেচনা করা যায়। মানুষের মুখের কথা আসলে কতকগুলো ধ্বনির সমষ্টি।

বর্ণ ঃ যে সব চিহ্ন দিয়ে ধ্বনি নির্দেশ করা হয় তাকে বর্ণ বলে। ধ্বনিগুলো মুখে উচ্চারিত হয়। তার লিখিত প্রতীক হল বর্ণ। বর্ণ তাই ধ্বনির লিখিত রূপ, ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন বা ধ্বনির প্রতীক। যেমন ঃ অ, আ, ক, খ ইত্যাদি।

স্বরচিহ্ন ঃ ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বর ধ্বনি যুক্ত হলে, তা লেখার সময় ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণটিকে না লিখে স্বরবর্ণের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নকেই বলে স্বরচিহ্ন।

নিচে চিহ্নগুলো দেখানো হল।

স্বরধ্বনি	স্বরবর্ণ	স্বরচিহ্ন	নাম
অ	অ	×	×
আ	আ	া	আ-কার
ই	ই	ি	হ্রস্ব-ই-কার
ঈ	ঈ	ী	দীর্ঘ-ই-কার
উ	উ	ু	হ্রস্ব-উ-কার
ঊ	ঊ	ূ	দীর্ঘ-উ-কার
রি	ঋ	ৃ	ঋ-কার
এ	এ	ে	এ-কার
ওই	ঐ	ৈ	ঐ-কার
ও	ও	ো	ও-কার
ওউ	ঔ	ৌ	ঔ-কার

উ, ঊ, ঋ—এই তিনটির স্বরচিহ্নের একাধিক রূপ আছে। উ → কু ; ক্তু ; শু ; হু ; রু। ঊ → কূ ; রূ। ঋ ঃ কৃ ; হৃ। কিন্তু এখন এদের একই রকম ভাবে লেখার রীতিও প্রচলিত হচ্ছে। কু ; ক্তু ; শু ; হু ; রু ; কূ ; রূ ; কৃ ; হৃ।

কার বা স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ঃ স্বরবর্ণ যখন কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় তখন এর পূর্ণ রূপ লেখা হয়। যেমন ঃ অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও ঔ।

স্বরবর্ণের এই পূর্ণ রূপ শব্দের যে কোন জায়গায় বসতে পারে। এই স্বরধ্বনি যখন ব্যঞ্জন ধ্বনির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় তখন সে স্বরধ্বনি একটি সংক্ষিপ্ত রূপ লাভ করে। স্বরবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে 'কার'। যেমন ঃ আ-এর

সংক্ষিপ্ত রূপ 'া', ই-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'ি' ইত্যাদি। স্বরবর্ণের নামেই এই সংক্ষিপ্ত রূপের নাম। যেমন ঃ আ–কার (া), ই-কার (ি), ঈ-কার (ী), উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ), ঋ-কার (ৃ), এ-কার (ে), ঐ-কার (ৈ), ও-কার (ো), ঔ-কার (ৌ)।

অ-কারের কোন সংক্ষিপ্ত রূপ নেই। ব্যঞ্জনবর্ণে তা মিশে থাকে। যেমন ঃ শত। এখানে শ ও ত-র সঙ্গে অ মিশে আছে। যেখানে অ থাকে না সেখান হস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ চুমকি। তবে এখনকার বানানে হস চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

কার প্রয়োগের রীতি ঃ

আকার (া), ঈ-কার (ী) বসে ব্যঞ্জনবর্ণের পরে। ই-কার (ি), এ-কার (ে), ঐ-কার (ৈ) ব্যঞ্জনবর্ণের আগে ; উ-কার (ু), ঊ-কার (ূ), ঋ-কার (ৃ) ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে। ও-কার (ো), ঔ-কার (ৌ) ব্যঞ্জনবর্ণের আগে ও পরে। যেমন ঃ

কা, কি, কী, কে, কৈ, কু, কূ, কো, কৌ।

উ-কারের বিভিন্ন রূপ ঃ মু, শু, রু, হু।

উ-কারের রূপ ঃ ভূ, রূ। ঋ-কার— হৃ, হৃ। তবে বর্তমানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বানানের নিয়মে এক রকম ব্যবহার করতে নির্দেশ রয়েছে। যেমন ঃ মৃ, শৃ, দ্রু, হৃ, গৃ, ভৃ, বৃ।

ফলা বা ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ঃ কখনও কখনও ব্যঞ্জনবর্ণ অন্য কোন স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে আকৃতির পরিবর্তন ঘটে বা সংক্ষিপ্ত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় ফলা। যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের নাম অনুসারে ফলার নামকরণ হয়।

যেমন ঃ ব-এ য-ফলা = ব্য, ব-এ র-ফলা = ব্র, ব-এ ল-ফলা = ব্ল ইত্যাদি। র-ফলা ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হলে বর্ণের নিচে বসে। যেমন ঃ ব্র। আবার র- যদি বর্ণে আগে আসে তবে (র্) রেফ নামে ওপরে বসে। যেমন যেমন ঃ র্ব।

অর্ধ ধ্বনি ঃ উচ্চারণের সময় জিহ্বার গতি উচ্চ ও সংকীর্ণতর একটি স্বরধ্বনির দিক থেকে প্রশস্ততর একটি স্বরধ্বনির দিকে অগ্রসর হলে যে শ্রুতি বা পিচ্ছিল ধ্বনি উচ্চারিত হয় তা, কিংবা জিহ্বার গতিশীলতা ও তৎসংশ্লিষ্ট একটি অসম্পূর্ণ স্বরধ্বনির সমষ্টিই অর্ধস্বরধ্বনি বাংলা য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি এর নিদর্শন।

যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে কোন স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো একত্রে উচ্চারিত হয়, এরূপ ধ্বনিকে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। এভাবে দুই বা বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি একত্রিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ তৈরি হয়। এর ফলে ব্যঞ্জনের মূল আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। যেমন ঃ ক + ত = ক্ত, ক + ষ = ক্ষ, ঙ + গ = ঙ্গ, জ + ঞ = জ্ঞ, ঞ + জ =ঞ্জ ইত্যাদি।

অক্ষর (সিলেবল) ঃ বাকযন্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বা সিলেবল (Syllable) বলে। স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত ক্ষুদ্র শব্দ বা শব্দাংশই অক্ষর। আ, ই, রা, জন, মন ইত্যাদি।

ধ্বনি দু প্রকার ঃ (১) স্বরধ্বনি ও (২) ব্যঞ্জন ধ্বনি।

(১) স্বরধ্বনি ঃ যে সব ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হয় তাকে স্বরধ্বনি বলে। এসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস মুখের কোথাও বাধা পায় না।

(২) ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ যেসব ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। এসব ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসা বাতাস মুখের কোন কোন জায়গায় বাধা পায় বা ঘষা খায়।

ধ্বনির লিখিত প্রতীক বর্ণ। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সব বর্ণকে একসঙ্গে বলে বর্ণমালা। ধ্বনির সঙ্গে মিল রেখে বর্ণকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ঃ (১) স্বরবর্ণ ও (২) ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরবর্ণ ঃ যেসব বর্ণ অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় তাকে স্বরবর্ণ বলে। যেমন ঃ অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ যে সব বর্ণ স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না সেগুলোকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন ঃ ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি।

বাংলা স্বরবর্ণ এগারটি— অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ = ১১টি।

ব্যঞ্জনবর্ণ ছত্রিশটি — ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য় = ৩৬টি।

এছাড়া তিনটি অতিরিক্ত চিহ্ন ং (অনুস্বার), ঃ (বিসর্গ), ঁ (চন্দ্রবিন্দু) বর্ণমালায় ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় শুদ্ধ ব্যঞ্জনধ্বনি 'ত' বোঝানোর জন্য 'ৎ' (খণ্ড ত) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

স্বরবর্ণের উচ্চারণে সবগুলোতে এক ধরনের সময় লাগে না, কখনও কম কখনও বেশি সময় লাগে। যেসব স্বরবর্ণ উচ্চারণে কম সময় লাগে তাকে বলে হ্রস্বস্বর। যেমন—অ, ই, উ, ঋ—এই চারটি। যেসব স্বরবর্ণ উচ্চারণে সময় বেশি লাগে তাকে বলে দীর্ঘস্বর। যেমন—আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ —এই সাতটি।

যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বর বা সন্ধিস্বর ঃ দুটি স্বরবর্ণ সমবায়ে উচ্চারিত ধ্বনিকে যৌগিক স্বর বা দ্বি-স্বর বা সন্ধিস্বর বলা হয়। যেমন— ঐ (অ + ই), ঔ (ও + উ), ইএ, ইউ, এই, আও ইত্যাদি ২৫টি সন্ধিস্বর বাংলায় আছে।

স্বরধ্বনি শ্রেণীবিভাগ ঃ স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটের ফাঁকের আকৃতি ও আয়তন এবং মুখের মধ্যে জিভের অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। ১. ঠোঁট দুটির মধ্যের ফাঁক যদি গোলাকৃতি হয়, তবে সে স্বর ধ্বনি বর্তুল ও কুঞ্চিত যেমন ঃ অ ; ও ; উ। আর ফাঁক প্রসারিত হলে সে স্বরধ্বনি প্রসৃত বা বিস্তারিত যেমন ঃ ই ; এ ; অ্যা, আ। ২.ফাঁকের আয়তন কম হলে তা সংবৃত যেমন ঃ ই ; উ। আর একটু বেশি হলে অর্ধসংবৃত যেমন ঃ এ ; ও। আয়তন বেশি হলে বিবৃত যেমন ঃ আ। এর থেকে সামান্য কম হলে অর্ধবিবৃত যেমন ঃ অ্যা। ৩. জিভ সামনের দিকে থাকলে স্বরধ্বনিকে বলা হয় সম্মুখ স্বরধ্বনি যেমন ঃ ই ; ঐ ; অ্যা। মাঝামাঝি জায়গায় থাকলে কেন্দ্রীয় যেমন ঃ আ। পিছনের দিকে থাকলে পশ্চাৎ যেমন ঃ উ ; ও ; অ। ৪। জিভ উপরের দিকে না নিচের দিকে থাকছে এই বিচারেও চারটে ভাগ আছে। একদম উপরে থাকলে ঊর্ধ্ব যেমন ঃ ই ; উ। তার একটু নিচে ঊর্ধ্বমধ্য যেমন ঃ এ ; ও। একেবারে নিচে থাকলে নিম্ন যেমন ঃ আ। তার থেকে সামান্য উপরে নিম্নমধ্য যেমন ঃ অ্যা ; অ। ৫. জিভ সামনের তালুর দিকে থাকলে স্বরধ্বনিকে বলা হয় তালব্য যেমন ঃ ই ; এ ; অ্যা। পিছনের দিকে থাকলে কণ্ঠ্য যেমন ঃ অ ; ও ; উ। স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ একরকম ছবির সাহায্যে বোঝানো হয়ে থাকে।

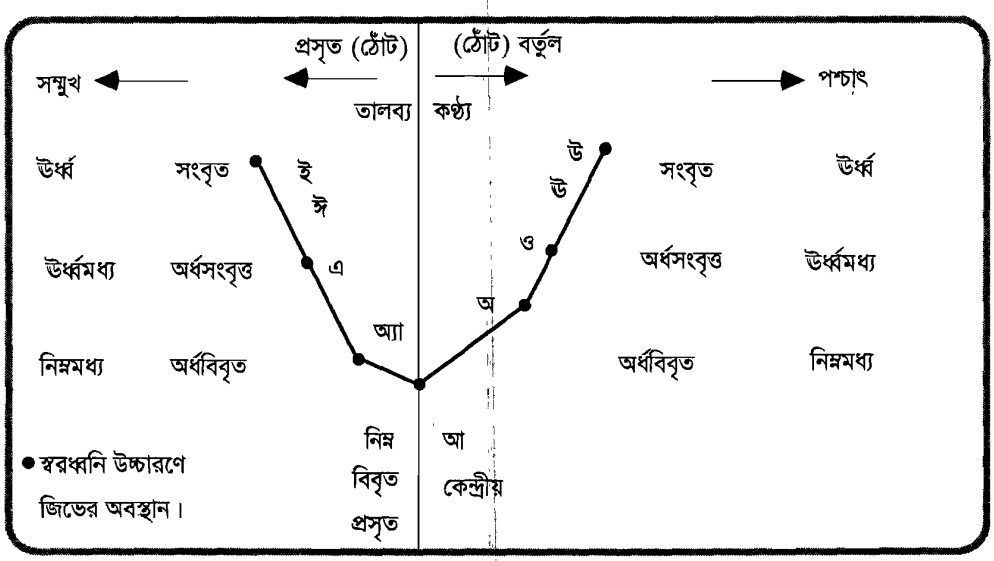

এই চিত্র অনুসরণ করলে স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ স্পষ্টতর হয়।

অ	নিম্নমধ্য	অর্ধবিবৃত	পশ্চাৎ	বর্তুল	কণ্ঠ্য
আ	নিম্ন	বিবৃত	কেন্দ্রীয়	প্রসৃত	
ই, ঈ	ঊর্ধ্ব	সংবৃত	সম্মুখ	প্রসৃত	তালব্য
উ, ঊ	ঊর্ধ্ব	সংবৃত	পশ্চাৎ	বর্তুল	কণ্ঠ্য
এ	ঊর্ধ্বমধ্য	অর্ধসংবৃত	সম্মুখ	প্রসৃত	তালব্য
ও	ঊর্ধ্বমধ্য	অর্ধসংবৃত	পশ্চাৎ	বর্তুল	কণ্ঠ্য
অ্যা	নিম্নমধ্য	অর্ধবিবৃত	সম্মুখ	প্রসৃত	তালব্য

স্বরধ্বনি উচ্চারণের স্থান ভিন্ন এবং উচ্চারণ অনুসারে তা পৃথক পৃথক নামে অভিহিত করা হয়। যেমন—

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুসারে বর্ণের নাম
অ, আ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্যবর্ণ
ই, ঈ	তালু	তালব্য বর্ণ
উ, ঊ	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্যবর্ণ
ঋ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ
এ, ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠ্য তালব্য বর্ণ
ও, ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ

বাগযন্ত্র ঃ

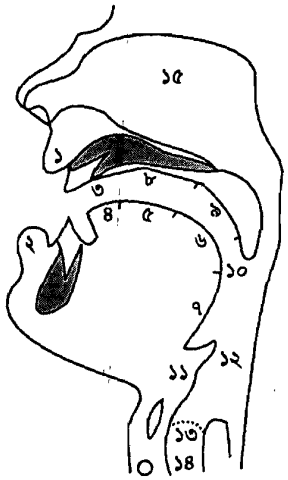

১ ওষ্ঠ	২ অধর	৩ দন্তমূল	৪ জিহ্বামুখ	৫ অগ্রজিহ্বা
৬ পশ্চজিহ্বা	৭ জিহ্বামূল	৮ তালু	৯ নিম্নতালু	১০ অলিজিহ্বা
১১ কণ্ঠমূল	১২ ঊর্ধ্বকণ্ঠ	১৩ কণ্ঠতন্ত্রী	১৪ কণ্ঠনালী	১৫ মস্তিষ্ক

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ কণ্ঠ থেকে ধারাবাহিকভাবে সাজানো। যেমন ঃ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	
শ	ষ	স	হ	
	ড়	ঢ়	য়	
	ং	ঃ		

স্বর ও ব্যঞ্জন নিয়ে আমাদের বর্ণমালা উচ্চারণস্থান ও ধ্বনিপ্রকৃতি অনুযায়ী বিন্যস্ত। বর্ণ বিন্যাসের ক্ষেত্রে এটি একটি বিস্ময়কর অবদান।

স্পর্শ বর্ণ ঃ ব্যঞ্জনবর্ণের ক থেকে ম পর্যন্ত বর্ণগুলোকে স্পর্শবর্ণ বলে। উচ্চারণের সময় জিভ মুখের ভিতর কণ্ঠ, তালু, মাড়ি বা দাঁত স্পর্শ করে এবং ওপরের ও নিচের ঠোঁট স্পর্শ করে। তাই এগুলোকে স্পর্শবর্ণ বলে অভিহিত করা হয়। কণ্ঠ, তালু, মাড়ি, দাঁত, ঠোঁট—এ পাঁচটি উচ্চারণ স্থানের জন্য পাঁচটি বর্গে এ বর্ণগুলোকে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রথম বর্ণের নাম অনুসারে প্রত্যেক বর্গের নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন ঃ

ক-বর্গ	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
চ-বর্গ	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ট-বর্গ	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
ত-বর্গ	ত, থ, দ, ধ, ন
প-বর্গ	প, ফ, ব, ভ, ম

শুধু ব্যঞ্জনধ্বনি বুঝতে বর্ণের নিচে হসন্ত চিহ্ন (্) দিয়ে লেখা হয়। যেমন ঃ ম। 'ম্' একটি ব্যঞ্জনধ্বনি। এ ব্যঞ্জনধ্বনি স্পষ্ট ও পূর্ণরূপে উচ্চারণ করতে হলে এর আগে বা পরে একটি স্বরধ্বনি যোগ করতে হবে। যেমন ঃ 'আম' (আগে স্বরধ্বনি 'আ যোগ), মা (= ম + আ ; পরে স্বরধ্বনি 'আ' যোগ)। এভাবে দেখা যায় যে, ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না।

নাসিক্য বর্ণ ঃ স্পর্শ বর্ণগুলোর মধ্যে ঙ, ঞ, ণ, ন, ম—এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণকালে মুখের বাতাস নাক দিয়ে বের হয় বলে এগুলোকে নাসিক্য বর্ণ বা আনুনাসিক বর্ণ বলা হয়।

স্পৃষ্ট বর্ণ ঃ ক-বর্গ, ট-বর্গ ও প-বর্গের প্রথম থেকে চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণকালে মুখের বিশেষ স্থান স্পৃষ্ট হয় বলে এগুলোর নাম স্পৃষ্ট বর্ণ।

ঘৃষ্ট বর্ণ ঃ চ, ছ, জ, ঝ বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বা ও তালুর স্পর্শের পরেই উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণজাত ধ্বনি বের হয় বলে এগুলোকে ঘৃষ্ট বর্ণ বলে।

মহাপ্রাণ বর্ণ ঃ প্রতি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণকালে এদের সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাস বায়ু বেশি বের হয় বলে এগুলোকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। যেমন—খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ, হ, ঢ়।

অল্পপ্রাণ বর্ণ ঃ প্রত্যেক বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্চারণকালে এদের সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাস বায়ু কম বের হয় বলে এগুলোকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলা হয় যেমন— ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, শ, স, ষ, য, র, ল, ড়।

ঘোষ বর্ণ ঃ প্রত্যেক বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের ধ্বনিতে গাম্ভীর্য বা ঘোষ আছে বলে এগুলোকে ঘোষ বর্ণ বলে। যেমন—গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম এবং য, র, ল, ব, হ।

অঘোষ বর্ণ ঃ প্রত্যেক বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের ধ্বনিতে গাম্ভীর্য অর্থাৎ ঘোষ নেই বলে এগুলোকে অঘোষ বর্ণ বলে। যেমন—ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ এবং শ, ষ, স।

উষ্ম বর্ণ ঃ উষ্ম বা শ্বাস যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ যেসব বর্ণ উচ্চারণ করা যায় সেগুলোকেই উষ্ম বর্ণ বলে। যেমন—শ, ষ, স, হ।

অন্তঃস্থ বর্ণ ঃ যেসব বর্ণ উচ্চারণে মুখ সম্পূর্ণ খোলা থাকে না, আবার বাতাস একেবারে বন্ধও থাকে না সেসব বর্ণকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। যেমন—য, র, ল, ব।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্থান এবং উচ্চারণ স্থান অনুসারে তাদের নাম ঃ

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণের স্থান অনুসারে নাম
ক, খ, গ, ঘ, ঙ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূল	কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ	তালু	তালব্য বর্ণ
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ
ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্ত্য বর্ণ
প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ঔষ্ঠ্য বর্ণ
অন্তঃস্থ ব	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ

বর্ণের মাত্রা ঃ

পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৩২	অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, দ, ন, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়।
অর্ধমাত্রার বর্ণ	৮	ঋ, খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ
মাত্রাহীন বর্ণ	১০	এ, ঐ, ও, ঔ, ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ

বর্ণমালার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

স্বরবর্ণ

অ ঃ বাংলা বর্ণমালার প্রথম বর্ণ এবং স্বরধ্বনি 'অ'-এর প্রতীক। স্বরধ্বনি 'অ' নিম্নমধ্য, অর্ধবিবৃত, পশ্চাৎ, বর্তুল ও কণ্ঠ্য।

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে একটি স্বরধ্বনি 'অ' নিহিত থাকে ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ সাধারণত একটি 'অ' যোগ করেই করা হয়। স্বরধ্বনি 'অ'-এর জন্য কোন পৃথক স্বরচিহ্ন নেই।

শব্দের প্রথমের 'অ' এবং শব্দমধ্যের নিহিত 'অ'-এর উচ্চারণ 'অ' অথবা 'ও'—এই দু রকমেই হতে পারে। শব্দশেষের নিহিত 'অ' প্রায় সর্বদাই 'ও' উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ প্রথমে 'অ' ঃ অনল ; অমিল। যেমন ঃ প্রথমে 'ও' ;

অতি—ওতি ; রবি—রোবি। যেমন ঃ মধ্যে 'অ' যেমন ঃ বিবর্ণ ; অকর্ণ ; কিংকর। যেমন ঃ মধ্যে 'ও' ঃ কলম— কলোম ; চরণ— চরোন। যেমন ঃ শেষে 'ও' ঃ আমন্ত্রিত— আমোন্‌ত্রিতো ; বাহিত—বাহিতো।

'অ' এবং নিহিত 'অ' কখন কিভাবে উচ্চারণ হবে (অর্থাৎ 'অ' হবে, না 'ও' হবে), তা শব্দের অন্যান্য ধ্বনির ওপর নির্ভর করে। তবে এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রমহীন নিয়ম করা যায় না।

শব্দের প্রথমের 'অ' যদি নঞর্থক উপসর্গ হয়, তখন তার উচ্চারণ 'অ', 'ও' নয়। যেমন ঃ অদৃশ্য (ওদৃশ নয়) ; অতুল (ওতুল নয়) ঃ অনবরত (অনোবরোতো—ওনোবরোতো নয়)।

বাংলায় অনেক ক্ষেত্রেই শব্দমধ্যেব কিংবা শব্দশেষের ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে নিহিত 'অ' বাদ যায়, হসন্ত উচ্চারিত হয়। এর জন্য কোন হস্‌চিহ্নের দরকার হয় না। যেমন ঃ বাদলা—বাদ্‌লা ; ম্রিয়মাণ—ম্রিয়োমাণ্‌ ; অন্ধকার—অন্‌ধোকার ; টনটন—টন্‌টন্‌ ; চরকা—চর্‌কা।

আ ঃ বাংলা বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ এবং স্বরধ্বনি আ-এর প্রতীক। এর স্বরচিহ্ন আ-কার (া) বর্ণের পরে বসে। আ-ধ্বনি নিম্ন, বিবৃত, কেন্দ্রীয় ও প্রসৃত। বর্ণ 'আ' কিংবা আ-কার সর্বদাই আ উচ্চারিত হয়।

ই ঃ বাংলা স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি ই-এর প্রতীক। ই-এর স্বরচিহ্ন ই-কার (ি) আশ্রিত ব্যঞ্জনের আগে ও উপরে বসে।

ঈ ঃ বাংলা স্বরবর্ণ দীর্ঘ-ঈ। এই বর্ণের উচ্চারণের কোন বিশেষ ধ্বনি বাংলায় নেই, স্বরধ্বনি ই-এর মতই উচ্চারিত হয়। ঈ-এর স্বরচিহ্ন ঈ-কার (ী) ব্যঞ্জনবর্ণের ডানে বসে।

উ ঃ বাংলা স্বরবর্ণ ও উ-ধ্বনির প্রতীক। উ-এর স্বরচিহ্ন উ-কার (ু) আশ্রিত ব্যঞ্জনের নিচে বসে।

ঊ ঃ বাংলা স্বরবর্ণ। দীর্ঘ ঊ-কারের উচ্চারণ বাংলাতে প্রায় নেই বললেই চলে। ঊ-কার স্বরচিহ্ন দীর্ঘ উ-কার (ূ) আশ্রিত ব্যঞ্জনের নিচে বসে। পৃথক উচ্চারণ নেই বলে তৎসম শব্দ নয় এমন শব্দে ঊ-এর ব্যবহার আজকাল হয় না।

ঋ ঃ ঋ কোন বিশেষ ধ্বনির প্রতীক নয়। সাধারণভাবে এর উচ্চারণ রি-এর মত। ঋ-এর স্বরচিহ্ন (ৃ) ব্যঞ্জনবর্ণ কিংবা যুক্তবর্ণের নিচে বসে। কেবল 'হ' এর ক্ষেত্রে তা হয়ে যায় 'হৃ', যদিও হৃ লেখার প্রচলন এখন বাড়ছে। ঋ-কার যোগ হলে আশ্রিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয় না। যেমন ঃ মাতৃ উচ্চারণ মা-তৃ, মাৎত্রি নয় ; আবৃত্তি— আ-বৃর্তি, আবব্রিত্তি নয়।

এ ঃ স্বরধ্বনি এ-এর প্রতীক। ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুক্তবর্ণের সঙ্গে যোগ হলে এ-এর স্বরচিহ্ন হয় 'ে' যা আশ্রিত ব্যঞ্জনের আগে বসে। বর্ণ এ এবং এ-কারের উচ্চারণ স্থির ও নির্দিষ্ট নয়। এ অনেক সময় 'অ্যা' উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ এক উচ্চারণ অ্যাক, কিন্তু একটি উচ্চারণ এক্‌টি (অ্যাকটি নয়), বেল (বেল্‌) কিন্তু খেলা (খ্যালা)। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে য-ফলা থাকলেও তার উচ্চারণ অনেক সময়েই এ হয়। যেমন ঃ ব্যক্তি (বেকতি), ব্যতীত (বেতিত)।

ঐ ঃ বাংলা স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি 'ওই'-এর প্রতীক। এই স্বরধ্বনি যৌগিক। এর স্বরচিহ্ন ঐ-কার।

ও ঃ স্বরধ্বনি ও-এর প্রতীক। এর স্বরচিহ্ন ও-কার। ও-বর্ণ ও ও-কার উচ্চারণের কোন ব্যতিক্রম নেই। সর্বদাই 'ও' উচ্চারিত হয়।

অন্যদিকে ও-বর্ণ কিংবা ও-কার না থাকা সত্ত্বেও নিহিত অ, কিংবা অ-বর্ণের উচ্চারণও হতে পারে। যেমন ঃ রবি—রোবি, পদ্য—পোদদো।

ঔ ঃ যৌগিক স্বরধ্বনি 'ওউ' এর প্রতীক। এর স্বরচিহ্ন ঔ-কার।

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক ঃ ক-বর্গের প্রথম বর্ণ। ক-ধ্বনি কণ্ঠ্য, স্পর্শ, অঘোষ ও অল্পপ্রাণ।

খ ঃ ক-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। খ-ধ্বনি কণ্ঠ্য, স্পর্শ, অঘোষ ও মহাপ্রাণ।

গ ঃ ক-বর্গের তৃতীয় বর্ণ। গ-ধ্বনি কণ্ঠ্য, স্পর্শ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ।

ঘ ঃ ক-বর্গের চতুর্থ বর্ণ। ঘ-ধ্বনি কণ্ঠ্য, স্পর্শ, ঘোষ ও মহাপ্রাণ।

ঙ ঃ ক-বর্গের পঞ্চম বর্ণ। এর উচ্চারণ অনুস্বারের মত। তবে অনুস্বারের সঙ্গে আ-কার, ই-কার প্রভৃতি যোগ হতে পারে না, কিন্তু ঙ-র সঙ্গে হয়। যেমন ঃ রঙিন, বাঙালি। ঙ-ধ্বনির মধ্যে গ-ধ্বনি নেই। বাঙালি > বাংআলি। ঙ-ধ্বনি স্পর্শ, কণ্ঠ্য ও নাসিক্য। শব্দের প্রথম ও ব্যঞ্জনধ্বনির পর ঙ বসতে পারে না। এই কারণে ঙ-য় গ অথবা ঙ-য ক হয় (ঙ্গ, ঙ্ক)। কিন্তু ক-য়ে ঙ বা গ-য়ে ঙ হওয়া সম্ভব নয়।

চ ঃ চ-বর্গের প্রথম বর্ণ। চ-ধ্বনি তালব্য, ঘৃষ্ট, অঘোষ ও অল্পপ্রাণ। এ ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনিও বলা হয়।

ছ ঃ চ-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। ছ-ধ্বনি তালব্য, ঘৃষ্ট, অঘোষ ও মহাপ্রাণ। এ ধ্বনিকে স্পর্শ ধ্বনিও বলা হয়।

জ ঃ চ- বর্গের তৃতীয় বর্ণ। জ-ধ্বনি তালব্য, ঘোষ ও অল্পপ্রাণ। স্পর্শ ধ্বনি।

ঝ ঃ চ-বর্গের চতুর্থ বর্ণ। ঝ-ধ্বনি তালব্য, ঘৃষ্ট, ঘোষ ও মহাপ্রাণ। স্পর্শ ধ্বনি।

ঞ ঃ চ-বর্গের পঞ্চম বর্ণ। ঞ কোন নির্দিষ্ট ধ্বনির প্রতীক নয়। পৃথক ভাবে ঞ-এর ব্যবহার কয়েকটি মাত্র শব্দে দেখা যায়। যেমন ঃ মিঞা, গোসাঞ। যুক্তবর্ণ হিসেবে ঞ-র ব্যবহার আছে।

ট ঃ ট-বর্গের প্রথম বর্ণ। ট-ধ্বনি মূর্ধন্য, স্পর্শ, অঘোষ ও অল্পপ্রাণ।

ঠ ঃ ট-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। ঠ-ধ্বনি মূর্ধন্য, স্পর্শ, অঘোষ ও মহাপ্রাণ।

ড ঃ ট-বর্গের তৃতীয় বর্ণ। ড-ধ্বনি মূর্ধন্য, স্পর্শ ও অল্পপ্রাণ।

ঢ ঃ ট-বর্গের চতুর্থ বর্ণ। ঢ-ধ্বনি মূর্ধন্য, স্পর্শ ও মহাপ্রাণ।

ণ ঃ ট-বর্গের পঞ্চম বর্ণ। বাংলা রীতিতে ণ-এর ধ্বনি ন-এর মত। বাংলায় যেভাবে উচ্চারিত হয় তাতে 'ণ' বা ন-ধ্বনি দন্তমূলীয়, নাসিক্য ও স্পর্শ।

ত ঃ ত-বর্গের প্রথম বর্ণ। ত-ধ্বনি দন্ত্য, স্পর্শ, অঘোষ ও অল্পপ্রাণ। হসন্ত ত-এর এর জন্য একটি পৃথক বর্ণ আছে - 'ৎ' (খণ্ড ত)।

থ ঃ ত-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। থ-ধ্বনি দন্তব, স্পর্শ, অঘোষ ও মহাপ্রাণ।

দ ঃ ত-বর্গের তৃতীয় বর্ণ। দ-ধ্বনি দন্ত্য, স্পর্শ, ঘোষ ও অল্পপ্রাণ।

ধ ঃ ত-বর্গের চতুর্থ বর্ণ। ধ-ধ্বনি দন্ত্য, স্পর্শ, ঘোষ ও মহাপ্রাণ।

ন ঃ ত-বর্গের পঞ্চম বর্ণ। ন-ধ্বনি দন্তমূলীয়, নাসিক্য। স্পর্শ ধ্বনি।

প ঃ প-বর্গের প্রথম বর্ণ। প-ধ্বনি ওষ্ঠ্য, স্পর্শ, অঘোষ ও অল্পপ্রাণ।

ফ ঃ প-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। ফ-ধ্বনি ওষ্ঠ্য, স্পর্শ, অঘোষ ও মহাপ্রাণ।

ব ঃ প-বর্গের তৃতীয় বর্ণ। বাংলা বর্ণমালায় দুটি ব-বর্ণ পাওয়া যায়। প-বর্গের তৃতীয় বর্ণ যে 'ব' তাকে বলা হয় বর্গীয় ব। বর্ণমালায় ল-এর পরের বর্ণও 'ব'। এর নাম অন্তঃস্থ ব। বাংলা উচ্চারণে এই দুই ব-এর কোন পার্থক্য নেই। তাই এখন একটিই 'ব' বিবেচিত হয় এবং সেটি বর্গীয়। বর্গীয়-ব ধ্বনি ওষ্ঠ্য, স্পর্শ, ঘোষ ও অল্পপ্রাণ।

ভ ঃ প-বর্গের চতুর্থ বর্ণ। ভ-ধ্বনি ওষ্ঠ্য, স্পর্শ, ঘোষ ও অল্পপ্রাণ।

ম ঃ প-বর্গের পঞ্চম বর্ণ। ম-ধ্বনি ওষ্ঠ্য, স্পর্শ ও নাসিক্য।

য ঃ য-ধ্বনির প্রতীক। বাংলায় অবশ্য অন্তঃস্থ-য ও বর্গীয়-জ-এর উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই। যেমন ঃ যুঁই—জুঁই। এর বিচারে য-কে অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন বলা চলে না। য-অন্য কোন ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে য-ফলা বলা হয়। আর তার জন্য 'ɟ'-এই প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

য় ঃ অর্ধস্বর। য়-কে অন্তঃস্থ বর্ণও বলা যেতে পারে। 'য়' কখনও শব্দের প্রথমে বসে না। য়-এর ধ্বনিকে শ্রুতিধ্বনি বলা হয়।

র ঃ অন্তঃস্থবর্ণ। র-ধ্বনি রণিত ও দন্তমূলীয়। যুক্তবর্ণে 'র' অন্য বর্ণের পরে লাগালে তা র-ফলার রূপ নেয়। যার চিহ্ন বর্ণটির নিচে বসে। যেমন ঃ প্র, ব্র, ক্র, ম্র। আগে যুক্ত হলে হয় রেফ যার চিহ্ন ' ́ '। এটি বর্ণটির উপরে বসে। যেমন ঃ র্ক, র্ম, র্প, র্ণ।

ল ঃ ল-ধ্বনি দন্তমূলীয়, অল্পপ্রাণ ও পার্শ্বিক। ল-কে অন্তঃস্থ বর্ণ হিসেবেও ধরা হয় এবং এই বিচারে 'ল' তরল স্বর।

শ ঃ শ-ধ্বনি তালব্য, উষ্ম (সংকীর্ণ) ও শিস। বাংলায় শ-এর উচ্চারণ অনেক সময়েই দন্তমূলীয় স-এর মত হয়। যেমন ঃ বিশ্রী, শ্রাবণ।

ষ ঃ ষ-ধ্বনির উচ্চারণ হওয়া উচিত মূর্ধন্য। উষ্ম, শিস। কিন্তু বাংলায় ষ-এর কোন পৃথক উচ্চারণ নেই, শ-এর মতই এর উচ্চারণ। ষ্ট, ষ্ঠ প্রভৃতি যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধ্বনির প্রভাবে এর ধ্বনি হয় মূর্ধন্য। যেমন ঃ অষ্ট, প্রতিষ্ঠা।

স ঃ স-ধ্বনি দন্ত্য, উষ্ম ও শিস। তবে বাংলায় স-এর উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ-এর ধ্বনির মত তালব্য হয়ে থাকে। তবে দন্ত্য-উচ্চারণও হয় এবং প্রধানত পাওয়া যায় যুক্তবর্ণে ও প্রতিবর্ণীকৃত বিদেশী শব্দে। যেমন ঃ স্থান, স্ত্রী, সৃজন, সাইকেল, বাস। অন্যদিকে সাবান, সাধু, স্বকীয়, সাধারণ ইত্যাদি অনেক শব্দেরই স-এর উচ্চারণ তালব্য।

হ ঃ হ-ধ্বনি কণ্ঠনালীয়, উষ্ম ও ঘোষ।

ং ঃ অনুস্বার। উচ্চারণে ং ও ঙ-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বর্ণ হিসেবে অনুস্বার অযোগবাহ বর্ণ। স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ এর কোন দলেই 'ং' পড়ে না।

ঃ ঃ বিসর্গ। ঃ-এর ধ্বনি হ-ধ্বনির কাছাকাছি। তবে বাংলায় বিসর্গের অন্য উচ্চারণও আছে। যাঃ, আঃ, ওঃ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উচ্চারণ হ-এর মত। কিন্তু শব্দের মধ্যের বিসর্গ পরবর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করে। যেমন ঃ দুঃখ > দুকখ, দুঃসাধ্য-দুসসাদধো। বিসর্গকে অযোগবাহ বর্ণ বলা হয়। কারণ বিসর্গ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ কোনটাই নয়। বিসর্গ আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণও বটে। কারণ এর কোন নিজস্ব ধ্বনি নেই, ফলে উচ্চারণ স্থানও নেই। যে ধ্বনির সঙ্গে যোগ হয় তার উচ্চারণ স্থানই দখল করে।

ঁ ঃ চন্দ্রবিন্দু। প্রকৃতপক্ষে অনুনাসিক ধ্বনি চিহ্ন। চন্দ্রবিন্দু কোন স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় এবং বর্ণটির বা স্বরচিহ্নটির মাথায় বসে। যেমন ঃ আঁক, বাঁধা, বঁড়শি, পৌঁছানো।

দ্রষ্টব্য ঃ ঙ, ঞ, ণ, ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ এ বর্ণগুলো শব্দের প্রথমে বসে না।

বাংলা বর্ণমালার উচ্চারণ

অ-এর প্রকৃত উচ্চারণ ঃ

অ—অ-এর প্রকৃত উচ্চারণ ইংরেজি fall এর 'a'র মতো। এই 'অ' কণ্ঠজাত বর্ণ।

'অতুলনীয় শব্দে 'অয়ের প্রকৃত উচ্চারন বজায় থাকছে। 'অতুল' এর 'অ'যের উচ্চারণ হবে 'ও' অর্থাৎ অতুল > ওতুল। এই 'ও' 'অ'-এর বিকৃত উচ্চারণ।

এই 'অ'-এর প্রকৃত উচ্চারণ কোথায় বজায় থাকবে আর কোথায় তা বিকৃত হয়ে যাবে তার কিছু নিয়ম ঃ

আদ্য অ ঃ

◆ একাক্ষর হলন্ত শব্দে আদ্য 'অ' প্রকৃত উচ্চারণে থাকবে। ফল, জল, মল, কল, রস ইত্যাদি। এদের সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলেও প্রকৃত উচ্চারণ বজায় থাকবে ; ফলা, জলা, মলা, কলা, রসা ইত্যাদি। এ ছাড়া প্রকৃত উচ্চারণ বজায় থাকবে—

◆ সহ শব্দের 'স'-তে সজল, সফল, সকল, সস্ত্রীক, সপুত্র, সহোদর, ইত্যাদিতে।

◆ সম্ উপসর্গের স-তে ঃ সংগ্রহ, সঞ্চয়, সমাদর, সম্রাট, সমবয়, সম্মোহ ইত্যাদিতে।

◆ নঞর্থক অ-তে ঃ অবিরাম, অনত, অধীর, অস্বস্তি, অবশ্য ইত্যাদিতে।

◆ ধ্বনিবাচক শব্দের আদ্য অক্ষরে ঃ মড়্মড়্, মর্মর, কড়্কড়্, ঝম্ঝম্, ছম্ছম্ , গম্গম্, দপ্দপ্ ইত্যাদিতে।

বিকৃত উচ্চারণ (অ > ও)

◆ আদ্য অক্ষরের পর ই-ঈ, উ-ঊ, য-ফলা থাকলে—গতি, সতী, মতি, অতি, ক্ষতি, নদী, গদি, যদি, কটূক্তি, অত্যুক্তি, অভ্যুদয়, সত্য, সত্যি ইত্যাদি।

◆ ক্ষ বা খ্য পরে থাকলে—বক্ষ, সখ্য, রক্ষা ইত্যাদি।

◆ আদ্য অ রফলাযুক্ত বর্ণের অঙ্গ হলে—ব্রজ, ভ্রম, ব্রত, ব্রণ, শ্রবণ, শ্রম, গ্রহণ, গ্রহ, প্রকৃত, প্রভু ইত্যাদি।

◆ ঋ-ফলা যুক্ত বর্ণ পরে থাকলে—বক্তৃতা, ভর্তৃহরি, মসৃণ, প্রভৃতি, প্রকৃষ্ট, প্রসূত ইত্যাদি।

মধ্যবর্তী অ ঃ

মধ্যবর্তী 'অ' অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ও' হয়।

অন্ত্য অ ঃ

অন্ত্য 'অ' উচ্চারিত হলে 'ও' হবে।

◆ বড়, ছোট, কাল, কৃষ্ণবর্ণ, ভাল উত্তম ইত্যাদি। এগুলোকে ও-কার দিয়েও লেখা হয় ; বড়ো, ছোটো, কালো, ভালো ইত্যাদি।

◆ যত, তত, এত, কেন ইত্যাদি সর্বনাম শব্দ।

◆ এগারো থেকে আঠারো পর্যন্ত সংখ্যা।

◆ খাওয়ান, দেখান, শোনান, পড়ান ইত্যাদি ক্রিয়াবিশেষ্য পদে এগুলো ওকার দিয়ে লেখাই ভাল। খাওয়ানো, দেখানো, শোনানো ইত্যাদি।

◆ দ্বিরুক্তি বিশেষণ শব্দে—ছলছল, কলকল, মরমর ইত্যাদি। এগুলো 'ও' দিয়েও লেখা হয় কিন্তু ঝর্ঝর্, সব্সব্ (অ-ধ্বনি লোপ হল বলে)।

◆ তুল্য অর্থে 'মত'—মত লেখাই অনেকের পছন্দ।

◆ পদান্তে যুক্ত বর্ণ থাকলে বা 'হ' থাকলে অস্ত, সূর্য, বজ্র, পূর্ব, দাহ, প্রবাহ ইত্যাদি।

◆ অন্য অক্ষরের আগে ং ঃ থাকলে—অংশ, ধ্বংস, দুঃখ, নিঃস্ব।

◆ ত, ইত, তর, তম প্রত্যয় যুক্ত বিশেষণে—গত, শ্রুত, শীত, অভ্যর্থিত, মহত্তর, মহত্তম ইত্যাদি।

◆ ঢ়-কারান্ত বিশেষণে— গাঢ়, মূঢ়, দৃঢ় ইত্যাদি।

◆ ইকার বা একারের পর য় থাকলে—প্রিয়, দেয়, নির্ণেয় ইত্যাদি।

◆ অন্ত্যবর্ণের আগে ঝ, ঐ, ঔ থাকলে—তৃণ, বৃষ, শৈল, দৈব, মৌন ইত্যাদি।

অনুচ্চারিত অ ঃ

এ ছাড়া অন্যত্র 'অ' প্রায়ই অনুচ্চারিত। একাক্ষর ঃ ফল, জল ইত্যাদি। দ্ব্যক্ষর ঃ শ্রবণ, দর্শন, পতন ইত্যাদি। ত্র্যক্ষর ঃ মহাবল, অবশেষ ইত্যাদি।

এরকম একাক্ষর শব্দ সমাসের পূর্ব পদ হলে অ > ও হবে। ফল (ফল্) কিন্তু ফলবান্ (ফলোবান্), লোক (লোক্) কিন্তু লোকলজ্জা (লোকোলজ্জা), লোক (লোক্) কিন্তু লোকগীত (লোকোগীত), তেমনি লোকসঙ্গীত (লোকোসঙ্গীত), জলমগ্ন (জলোমগ্ন) ইত্যাদি।

আ—কণ্ঠ্যবর্ণ ঃ

উচ্চারণ ইং far এর 'a' র মতো। সংস্কৃতে দীর্ঘস্তর হলেও বাংলায় হ্রস্বস্বর। মাতা—দ্ব্যক্ষর দু'মাত্রায় শব্দ। হলন্ত হলে অবস্থান অনুযায়ী দীর্ঘ ও দু'মাত্রায় হতে পারে। আশ্চার্য (আশ্চর্য)—এখানে 'আ' মাতা'র 'আ'-র চেয়ে দীর্ঘতর, তবে দু'মাত্রা ধরা হবে কিনা, তা অবস্থানের উপর নির্ভর করে। 'আ' বর্ণের প্রতিরূপ বা চিহ্ন = 'া'। ম্আ= মা।

ই—তালব্য বর্ণ ঃ

উচ্চারণ ইং dig , sick ইত্যাদির 'i'-এর মত। প্রতিরূপ ি- বিলিতি।

ঈ—তালব্য বর্ণ ঃ

উচ্চারিত হয় ই-এর মতই। তালব্য বর্ণ। সংস্কৃতে দীর্ঘস্তর ধরা হলেও বাংলায় ই-এর মতই হ্রস্বস্বর। প্রতিরূপ ী-নদী। হলন্ত হলে সামান্য দীর্ঘায়িত। নদীর (নদর্-এই 'র' দী কে 'যদি'র 'দি'র চেয়ে সামান্য দীর্ঘ করে তুলেছে। দু'মাত্রা ধরা হবে কিনা তা প্রয়োগের উপর নির্ভর করে।

উ—ওষ্ঠ্য বর্ণ ঃ

হ্রস্বস্বর। উচ্চারণ ইং 'put'-এর 'u'-এর মত। হলন্ত হলে বা এর পর ং ঃ থাকলে দীর্ঘ হতে পারে। উল্ উঃ উং এই সব উচ্চারণে কিছুটা দীর্ঘ। প্রতিরূপ ' ু '—মুকুল। 'মুকুতা'র 'কুয়ের চেয়ে 'মুকুল'-এর 'কু'-এর দৈর্ঘ্য সামান্য বেশি।

ঊ—ওষ্ঠ্য বর্ণ ঃ

'উ'-র মতই উচ্চারণ, একই উচ্চারণ স্থান। 'উ'-এর মতই হ্রস্বস্বর হলন্ত হলে দীর্ঘ হতে পারে। অনেক সময় অর্থে জোর দেবার প্রয়োজনে দীর্ঘ ও দু'মাত্রায় উচ্চারণ দেখা যায় ; বিমূঢ় বিস্ময়ে। প্রতিরূপ ' ূ '।

ঋ—মূর্ধন্য বর্ণ ঃ

ঋ উচ্চারণ সংস্কৃতে 'রব্'-এর মত ছিল। এখন এর উচ্চারণ 'রি'-রিষি রিণ। শব্দের আদিতে থাকলে ঋ-উচ্চারণ নিয়ে গণ্ডগোল নেই—কৃতার্থ (ক্রিতার্থ), বৃথা (ব্রিথা) ইত্যাদি। গণ্ডগোলটা ঘটে ঋ-ফলাযুক্ত শব্দ মাঝখানে থাকলে। যেমন, অমৃত, আবৃত্তি উচ্চারিত হয় 'অম্মৃত', 'আব্বৃত্তি'। 'আবৃত্তি'র উপর বক্তা দিচ্ছেন যিনি তাঁকেও 'আব্বৃত্তি' উচ্চারণ করতে শুনেছি। ('আব্বৃতি'ও শোনা যায়)। যিনি 'অমৃত', 'আবৃত'-র 'ঋ' আলতোভাবে উচ্চারণ করছেন, তিনিও 'চরণামৃত'-কে 'চরণাম্মৃত' করে ফেলেন। মাঝখানে যে ঋ তাকে দ্বিত্ব না করে আলতোভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

এ—কণ্ঠতালব্য বর্ণ ঃ

এ কারের উচ্চারণও বাংলা দু'রকম—একটি প্রকৃত, আর একটি বিকৃত। প্রকৃত উচ্চারণ ইংরেজির bed শব্দের 'e'র মত—কেকা, রেখা ইত্যাদি। বিকৃত উচ্চারণ ইংরেজির bad শব্দের 'a' মত। যেমন দেখা (দ্যাখ্যা), একা (অ্যাকা) ইত্যাদি। এই ধ্বনিটির প্রতিরূপক বর্ণ বাংলায় নেই। 'অ্যা' দিয়ে লেখা হয়, আর ফলা হিসেবে চলে '্যা' (য-ফলা আকার) যেমন প্যাঁচা।

এ-কারের উচ্চারণ ঃ

এ-কারের প্রকৃত উচ্চারণ বা স্বাভাবিক উচ্চারণ কোথায় হবে এবারে তা দেখা যাক—

◆ তৎসম শব্দের আদ্য 'এ'-কারে ; লেখা, কেকা, একক, কেশ, মেষ, দেশ, বেদনা, বেষ্টিত ইত্যাদি।

◆ অভিশ্রুতি-জনিত এ অর্থাৎ ইয়া ? এ—মেঠো, টেকো, হেটো, গেছো, খেয়ে, নেয়ে ইত্যাদি।

◆ সর্বনামে-এ, যে, সে, যেখানে, সেখানে।

◆ ফার্সি 'বে' উপসর্গে ঃ বেকার, বেঠিক, বেবন্দোবস্ত, বেদম ইত্যাদি।

◆ বিকৃত উচ্চারণকে নিয়মে বাঁধা যায় না। একটা বর্ণানুক্রমিক তালিকা অবশ্য দেয়া যায় ঃ

এক, একটা, একলা, এত, এমন, এলানো, কেনো,*খেপা, কেমন, খেলা, খেলনা, গেল (গেলো), ঘেঁষা, চেঁচা, চেপটা, চেলা, *ছেঁকা, ছেনা, *জেঠা, *টেক, ঠেকা (বাধা পাওয়া), *ঠেঙ, *ঠেঙা, *ঠেলা, ভেলা, তেমন, তেলাপোকা, *থেঁতলা, *থেবড়া, *দেখা, দেওর, *ধেবড়া, *নেংচানে (লেংচানো), নেঙড়া, *নেকড়া, *নেকা *লেজ, *লেজা, *নেপা, পেঁচা, *ফেকাসে, *ফেটানো, ফেঁটানো, *ফেন, ফেনা, ফেলনা, *ফেসাদ, *বেঙ, *বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, বেচা, বেড়া, বেড়ানো, *বেদড়া, বেলা, বেসাতি, ভেলা, *ভেস্তানো, মেলা (fair), *লেংচানো, *সেঁকড়া, সেঁকা, *হেপা, হেলা, হেস্তনেস্ত।

(* চিহ্নিত শব্দগুলো 'ে্যা' দিয়েও লেখা হয়। যেমন, খ্যাপা, চ্যাপটা, ছ্যাঁকা, ট্যাঁক, ঠ্যাঙ ইত্যাদি।)

ও—কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ ঃ

উচ্চারণ ইংরেজি 'no' এর 'o'র মত। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বর বাংলায় হ্রস্বস্বর। বাংলার মৌলিক স্বরের অন্যতম। হলন্ত শব্দে 'ও' দীর্ঘ হতে পারে। 'ওলো'তে 'ও' হ্রস্ব, কিন্তু 'ওল' (ওল্)- এ তুলনায় দীর্ঘ।

ঐ, ঔ-যথাক্রমে ও + ই, ও + উ ঐ কণ্ঠতালব্য, ঔ কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ। এই দুটি ধ্বনিকে বলে যৌগিক বা যুগ্মস্বর।

ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ ঃ

ব্যঞ্জন বর্ণমালায় বর্ণগুলো উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বিন্যস্ত।

ক বর্ণ ঃ

ক খ গ ঘ ঙ জিভের মূল বা পিছনের দিক দিয়ে কণ্ঠের তালুর কোমল অংশ স্পর্শ করে উচ্চারিত। এগুলোকে কণ্ঠ্যবর্ণ বলে। ঙ অনুনাসিক বর্ণ। উচ্চারণ করার সময় নাক দিয়ে বায়ু বার হয়। উচ্চারণ ই ng-র মত।

চ বর্গ ঃ

চ ছ জ ঝ ঞ জিভের মাঝের অংশ দিয়ে তালুর সামনের অংশ বা কঠিন অংশ স্পর্শ করে উচ্চারিত। এগুলোকে তালব্য বর্ণ বলে। জিভ আর তালুর স্পর্শের পরে দু'য়ের মাঝখানে বায়ুর ঘর্ষণ ঘটে। তাই একে ঘৃষ্টবর্ণ বলে। 'ঞ' অনুনাসিক বর্ণ। মিঞা (মিয়াঁ) শব্দে এর উচ্চারণ মেলে।

ট বর্গ ঃ

ট ঠ ড ঢ ণ বর্ণগুলো জিভের ডগাকে উলটিয়ে মূর্ধা আর তালুর কঠিন শীর্ষদেশের কাছে কঠিন অংশটি স্পর্শ করে উচ্চারিত। তাই এগুলোকে মূর্ধন্য বর্ণ বলে। জিভের অগ্রাংশ প্রতিবেষ্টিত করে (উল্টে দিয়ে) উচ্চারণ করা হয় বলে একে প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলে।

ড, ঢ ঃ

শব্দের মধ্যে বা শেষে এই দুটি বর্ণ যথাক্রমে ড় ও ঢ় হয়ে যায়। নতুন উচ্চারণে এ দুটি বর্ণে বিন্দু যোগ করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় এ দুটি ছিল না।

জিভের নিচের অংশ দিয়ে দন্তমূল তাড়ন করে উচ্চারিত হয় বলে এ দুটিকে তাড়নজাত ধ্বনি। বাড়ি, কাপড়, ঝড় ইত্যাদি শব্দে ড়-এর উচ্চারণ ধরা আছে। তেমনি 'ঢ়'-এর উচ্চারণ ধরা আছে রূঢ়, আষাঢ়, রাঢ়ী ইত্যাদি শব্দে। (ড় + হ = ঢ়)।

কোনও কোনও জায়গায় 'ড়' 'র'-এর মত উচ্চারিত হয়। তার ফলে ঘরভাড়া হয়ে পড়ে ঘড়ভারা। 'ঢ়' শিথিল উচ্চারণে ড় হয়ে ওঠে। একেবারে 'র'ও হয়ে পড়ে। সঠিক উচ্চারণে 'ড়'-এর উচ্চারণকে হ-এর দিকে ঠেলে দিতে হবে। যেমনঃ মূঢ়, দৃঢ়, আষাঢ়, রাঢ়ী।

ণ ঃ

মূর্ধন্য 'ণ'-এর প্রাচীন উচ্চারণ ছিল ড়ঁ-এর মত, বাংলায় দন্ত ন-এর সঙ্গে এর উচ্চারণ অভিন্ন।

ত বর্গ ঃ

ত, থ, দ, ধ, ন। এগুলো দন্ত্য বর্ণ। জিভের আগের দিককে পাখার মত প্রসারিত করে তা দিয়ে দাঁতের নিচু অংশ স্পর্শ করে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত।

ত থ দ ধ-এর আগে থাকলে (ন্ত, স্থ, ন্দ, ন্ধ) ন উচ্চারণে জিভ দাঁতের উপরে গিয়ে ঠেকে।

'ন' অনুনাসিক বর্ণ।

'ধ'-এর উচ্চারণে সাবধান হওয়া দরকার, অনেক সময় তা 'দ' এর মত হয়ে যায়।

ধাঁধা, সাধ্যসাধনা, ধরাধাম, বিধৃত, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বসুধা ইত্যাদি শব্দ 'ধ'-এর উচ্চারণ লক্ষণীয়।

প বর্গ ঃ

প ফ ব ভ ম এগুলো ওষ্ঠ্য বর্ণ। ওষ্ঠ (উপরের ঠোঁট) আর অধর (নিচের ঠোঁট) স্পর্শ কবে এই বর্ণগুলো উচ্চারিত হয়। ওষ্ঠ-অধরের স্পর্শ ঠিক মত না হলেই বায়ু নির্গত হয়ে উষ্মধ্বনি আসবে। ফলে ফ উচ্চারণ 'ph' না হয়ে, হবে 'f'-এর মত। 'ফুল' হয়ে উঠবে full , প্রফুল্ল হয়ে উঠবে Prafulla অথচ হওয়া উচিত Parphulla লেখাও উচিত 'ph' দিয়ে 'f' দিয়ে নয়।

'ম' অনুনাসিক বর্ণ, উচ্চারণে সময়ে নাক দিয়ে বায়ু বেরিয়ে আসে। নাক বন্ধ থাকলে 'ম' 'ব' হয়ে ওঠে।

য-র-ল-ব ঃ

এগুলো অন্তঃস্থ বর্ণ। স্পর্শ বর্ণ আর উষ্মবর্ণের (শ ষ স হ) মাঝখানে এদের অবস্থান বলে এই নাম।

'য' ও 'ব'-এর মূল উচ্চারণ ছিল যথাক্রমে 'ইয়' ও 'উঅ'। তাই এদের নাম ছিল অর্ধস্বর, ইংরেজি y ও w-এর মত। কিন্তু এখন উচ্চারণ বদলে গিয়েছে। 'য' এর উচ্চারণ 'জ'-এর মত, অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ এখন বর্গীয় ব-এর মত অর্থাৎ ইংরেজি 'b'-এর মত।

বাংলায় তৎসম নামের বানানে অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণে 'V' ব্যবহার করা হয়। যেমন, Vidyasagar.

বানানে 'য়' থাকলে তা আমরা y দিয়ে লিখি—প্রিয়নাথ = Priyanath.

র-ল—'র' ও 'ল' কে উচ্চারণে প্রলম্বিত করা যায় বলে (র্‌র্‌র্‌র্‌, ল্‌ল্‌ল্‌ল্‌) এ-দুটিকে তরল স্বর বলে। 'র'-কে কম্পনজাত ধ্বনি বলা হয়। কারণ জিভের ডগা দাঁতের গোড়ায় একাধিকবার দ্রুত আসতে এর উচ্চারণ। এর উচ্চারণ ইংরেজি 'r'-এর চেয়ে নরম।

ল--- জিভের ডগাকে মুখের মাঝামাঝি দাঁতের গোড়ায় ঠেকিয়ে রেখে জিভের দু'পাশ দিয়ে মুখের বাতাস বের করে দিয়ে এই বর্ণের উচ্চারণ ঘটে বলে এটিকে পার্শ্বধ্বনি বলে। উচ্চারণ ইংরেজি '*l* '-এর চেয়ে একটু নরম।

শ ষ স হ—এগুলো উষ্মবর্ণ । এদের উচ্চারণের সময় জিভ, তালু, দাঁত সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়েও নিশ্বাস বায়ুকে কখনও একেবারে রুদ্ধ করে না।

শ ষ স—এই তিনটির ধ্বনির শিশের মত বলে এদের শিশধ্বনি বলে।

যথাক্রমে তালু, মূর্ধা ও দন্ত স্পর্শ করে শ্বাসবায়ুকে সংকীর্ণ পথে বের করে দেয় এই বর্ণগুলো। এই জন্য এই তিনটি বর্ণকে বলা হয় তালব্য শ, মূর্ধন্য ষ আর দন্ত্য স।

এদের উচ্চারণ ছিল যথাক্রমেই ইংরেজি Sh, Kh আর 'S' এর মত। কিন্তু এখন তিনটির উচ্চারণই তালব্য 'শ'-এর মত 'Sh' বিশেষ। শ-ষ একই উচ্চারণ। শব আর সব— দুই উচ্চারণই এক। বাংলায় ইংরেজি S-এর মতো স-উচ্চারণ সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার বলেন, 'ভদ্রসমাজের অনুমোদিত উচ্চারণে ইহা বর্জনীয়'।

কোনও কোনও অঞ্চলের উচ্চারণে S= Sh, Sh= S, Seat হয়ে ওঠে Sheet, Shelf হয়ে ওঠে Self. অভ্যাসেই এ অভ্যাস দূর করা যায়। Sh উচ্চারণে জিভকে তালুর দিকে তুলতে হবে। আর 'S' উচ্চারণে জিভকে দাঁতের দিকে ঠেলতে হবে।

হ— উষ্মবর্ণ। কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন, শ, ষ, স-এর মত একেও প্রলম্বিত করা যায় (হ্‌ হ্‌ হ্‌)। এই 'হ' এর নাম প্রাণ অর্থাৎ বায়ু।

কণ্ঠনালীর মধ্যকার শ্বাসপথ চেপে ধরে 'হ' উচ্চারণ করতে গেলে এক-ধরনের স্পৃষ্ট ধ্বনি উচ্চারিত হয়, 'হ' উচ্চারিত হয়েও পরে 'অ' এর মত হয়ে যায়। এই 'অ'কে 'অ' লেখা হয়।

বাংলাদেশে 'হ' এর জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে এই 'অ' ধ্বনি শোনা যায়— হয় > 'অয়'। আবার বাংলাদেশে স্পষ্ট 'হ' উচ্চারিত হয় 'শ'-এর জায়গায়। শালা > হালা।

ং (অনুস্বার)— বাংলা ঙ'র মত উচ্চারণ। সংস্কৃত > সঙ্‌স্কৃত। এজন্য বানানে একটির বদলে অন্যটি দেখা যায়—রঙ— রং, সঙ— সং, বাঙলা— বাংলা।

ঃ (বিসর্গ)— এই বর্ণটি এক ধরনের 'হ' ধ্বনি। সাধারণ 'হ' একটু খোলতাই, এটি একটু চাপা।

মূলের উচ্চারণ ধরা পড়ে আঃ (আহ্‌), উঃ (উহ্‌), ওঃ (ওহ্‌) ইত্যাদি বিস্ময়সূচক অব্যয়ে।

সাধারণ উচ্চারণে বিসর্গ প্রায়ই অনুপস্থিত।

বিশেষতঃ, প্রধানতঃ, স্পষ্টতঃ, এ সব উচ্চারণে ঃ (বিসর্গ) অনুচ্চারিত, তাই আধুনিক বানানেও একে বিসর্জন দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে।

পদের মধ্যে থাকলে কিন্তু বিসর্গ বিশেষ একটি ভূমিকা নেয়, দ্বিত্ব করে তোলে পরবর্তী ব্যঞ্জনকে। যেমন, অতঃপর— অতপ্‌পর, দুঃখ—দুখ্‌খ, নিঃশেষ—নিশ্‌শেশ।

ঁ (চন্দ্রবিন্দু)— এই ধ্বনি স্বর ধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে— অঙ্ক > আঁক, শঙ্খ > শাঁখ, ক্রন্দন > কাঁদা, অঞ্চল > আঁচল ইত্যাদি।

দেশের দু-একটি অঞ্চলে এই অনুনাসিক উচ্চারণ বাদ পড়ে যায়। কাঁটা হয়ে ওঠে কাটা, দাঁড়ানো হয়ে ওঠে দাড়ানো।

যুক্তবর্ণ ঃ পর পর দুটি কিংবা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনিকে লেখার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলোকে একটার সঙ্গে অন্যটাকে জুড়ে দেওয়া হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের এই সংযুক্ত রূপের নাম যুক্তবর্ণ। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ দলাত্মক ও তার মধ্যে একটি করে নিহিত অ থাকে। যুক্তবর্ণে শেষের বর্ণটি ছাড়া অন্যগুলোর নিহিত -অ লোপ পায়। যেমন 'অমল' শব্দের উচ্চারণ অমোল্, বর্ণ বিশ্লেষণ-অ + ম্ + অ + ল্ + অ, শেষের 'অ' অবশ্য অনেক সময়েই উচ্চারিত হয় না। কিন্তু 'অম্ল'লেখা হলে তার উচ্চারণ 'অমলো' ; বর্ণ বিশ্লেষণ-অ + ম্ + ল্ + অ। এখানে 'ম্ল' যুক্তবর্ণ ও শেষে নিহিত অ-উচ্চারিত (যদিও তার উচ্চারণ এক্ষেত্রে 'ও')। বাংলায় অনেক যুক্তবর্ণ আছে। লক্ষণীয় ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণ যোগ হলে তাকেই যুক্তবর্ণ বলা হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরচিহ্ন যোগ হলে যুক্তবর্ণ হয় না। এই কারণে স্প, প্র যুক্তবর্ণ, কিন্তু সু, কি, কৃ, যুক্তবর্ণ নয়। দুই কিংবা তিন ব্যঞ্জনের যুক্তবর্ণ বাংলায় বেশি দেখা যায়, চার ব্যঞ্জনের যুক্তরূপ নেই। ১. দুই ব্যঞ্জনের যুক্তবর্ণ→ ক্য, ক্ট, ক্স,, ক্র ক্ল, ক্ত, ক্ক, ক্ব, খ্র, গ্র, গ্ল, গ্য, গ্ন, গ্ল, গ্ব, গ্দ, গ্ধ, গ্য, ঘ্ন, ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, জ্ঞ, ক্ষ, চ্চ, চ্ব, চ্ছ, চ্য, জ্য, জ্জ, জ্র, জ্ব, ঞ্চ, ঞ্জ, ঞ্ছ, ট্য, ট্র, ট্ট, ট্ব, ঠ্য, ড্য, ড্ড, ড্র, ঢ্য, ট্র, ণ্য, ণ্ন, ণ্ব, ণ্ড, ণ্ট, ন্ট, ণ্ঠ, ন্ম, ত্য, ত্ত, ত্ব, ত্থ, ত্র, থ্র, থ্ব, দ্য, দ্র, দ্ব, দ্ম, দ্ধ, দ্দ, ধ্য, ধ্র, ধ্ন, ধ্ব, ন্য, ন্ন, ন্দ, ন্ধ, ন্ত, ন্থ, ন্ব, ন্ম, প্য, প্র, প্ত, প্ন, প্ত, প্ট, প্স, প্ল, ফ্ল, ফ্র, ব্য, ব্র, ব্ব, ব্ল, ব্দ, ব্ধ, ভ্র, ভ্য, ম্য, ম্ল, ম্প, ম্র, ম্ম, র্ক, র্খ, র্গ, র্ঘ, র্চ, র্ছ, র্জ, র্ঝ, র্ট, র্ঠ, র্ড, র্ঢ, র্ণ, র্ত, র্থ, র্দ, র্ধ, র্ন, র্প, র্ফ, র্ব, র্ভ, র্ম, র্য, র্ল, র্শ, র্ষ, র্স, র্হ, ল্য, ল্ক, ল্গ, ল্ল, ল্ট, ল্ড, ল্প, ল্ফ, ল্ম, শ্য, শ্র, শ্চ, শ্ছ, শ্ল, শ্ব, শ্ম, ষ্ক, ষ্ট, ষ্ঠ, ষ্ণ, ষ্প, ষ্ম, ষ্য, স্ক, স্য, স্র, স্ল, স্ট, স্ত, স্থ, স্ন, স্প, স্ফ, স্ম, হ্য, হ্ল, হ্ন, হ্ব, প্রভৃতি। ২. তিন বর্ণের যুক্তবর্ণ ঃ ন্দ্র, ন্ত্র,স্ত্র, স্প্র, ষ্প্র, জ্জ্ব, চ্ছ্ব, ত্ত্ব, র্দ্র, ক্ষ্ম, ন্ত্ব, ঙ্ক্ষ, ক্ষ্য, ষ্ট্র, র্স্ট ইত্যাদি।

যুক্তবর্ণের শেষ বর্ণটি র, ম, ব এবং য হলে তাদের যথাক্রমে র-ফলা, ম-ফলা, ব-ফলা, ও য-ফলা বলা হয়। যুক্তবর্ণের প্রথম বর্ণ 'র' হলে তার জন্য একটি বিশেষ চিহ্ন আছে, তাকে বলা হয় রেফ যা পরের বর্ণের উপরে বসে। যেমন ঃ র্ক ; শর্করা ; বর্বর ; মর্ম। লেখার রীতি অনুযায়ী যুক্তবর্ণের দুটি রকমফের পাওয়া যায়। ১. স্বচ্ছ অর্থাৎ যুক্তবর্ণ গঠনকারী সংযুক্ত বর্ণগুলোকে আলাদা চেনা যায়। যেমন ঃ ক্ক ; ম্ম, স্প, গ্ম; ল্ল ; ম্ল ; স্ত ; শ্চ ; দ্ব ইত্যাদি। ২. অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ, যেখানে সংযুক্ত বর্ণের কোন একটিকে অথবা কোনটিকেই চেনা যায় না। যেমন ঃ প্র (প্ + র, কিন্তু র-এর চেহারা এখানে নেই) ; র্ব (র্ + ব, 'র' হয়ে গেল রেফ চিহ্ন যার সঙ্গে র-এর চেহারার মিল নেই) ; ক্য, প্য (য-এর রূপ বদলে যাচ্ছে) ; গন্ধ, দ্ধ, ন্ধ (ধ-কে চেনা যাচ্ছে না) ; ঞ্চ (ণ-কে ঞ মনে হয়)। ৩. কোনটাই চেনা যায় না, অর্থাৎ যুক্তবর্ণ এক পৃথক বর্ণের চেহারা নেয়। যেমন ঃ ক্ষ (ক্ + ষ) ; হ্ম (হ্ + ম) ; ঙ্গ (ঙ্ + গ) ; ত্র (ত্ + র) ; ক্ত (ক্ + ত) ; ভ্র (ভ্ + র) ; ঞ্চ (ঞ্ + চ) ইত্যাদি। এদের অনেকগুলোর অবশ্য বিকল্প স্বচ্ছ রূপ আছে। যুক্তবর্ণকে সংযুক্তবর্ণ বা যুক্তাক্ষর বলা হয়।

যুক্তবর্ণের উচ্চারণ ঃ

ক্ষ—'ক্'-এর সঙ্গে 'ষ্' জুড়ে এই বর্ণ, উচ্চারণ ছিল কষ্। হিন্দিতে মূল উচ্চারণ বজায় আছে— ক্ষতি = ক্ষতি, শিক্ষক-শিক্ষক। কিন্তু বাংলায় কোথাও 'খ' কোথাও 'ক্খ'। ক্ষেত্র > খেত, রক্ষা > রোক্খা।

জ্ঞ—জ্ + ঞ। প্রাচীন উচ্চারণে জ্-এর উচ্চারণ বজায় রেখে ঞ-কে 'ঙ' বা 'ন' করে নেয়া হত। 'বিজ্ঞান' উচ্চারণে শোনাত অনেকটা 'বিজ্ঙান' বা 'বিজন্যানে'র মত। বাংলা উচ্চারণে গ্গঁ। বাংলা উচ্চারণে বিগ্গাঁন। এইরকম আজ্ঞা = আগ্গাঁ, জ্ঞান = গ্গ্যান।

ক্ব—ক্ + ব (অন্তঃস্থ) মূল উচ্চারণ কুও বা কোও। নিক্কণ= নিক্ওয়ন্। কিন্তু বাংলায় উচ্চারণ 'ক্ক', তাই উচ্চারণে নিক্কণ = নিকক্ন।

ক্ম—ক্ + ম। মূল উচ্চারণে উভয় বর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত। রুক্মিণী=রুক্মিণী কিন্তু বাংলায় ক্ক বা ক্কঁ রুক্মিণী বা রুক্কিঁণী।

ত্ম—ত্ + ম্। মূল উচ্চারণে উভয় বর্ণই অবিকৃত। মহাত্মা = মহাৎমা, কিন্তু বাংলা ত্তঁ, মহাত্মা = মহাত্তাঁ।

শ্ম—শ্ +ম, মূল উচ্চারণে উভয় বর্ণই অবিকৃত। বাংলায় শ বা শঁ, তাই 'শ্মশান' উচ্চারণে 'শশান' বা 'শশাঁন' > শশাঁন।

ষ্ম—ষ্ + ম, মূল উচ্চারণে উভয় বর্ণই পৃথকভাবে উচ্চারিত। ভীষ্ম = ভীষমো। বাংলায় ভীশ্শোঁ অর্থাৎ ষ্ম = শঁশ।

স্ম—স্ + ম, মূল উচ্চারণে উভয় বর্ণই পৃথকভাবে উচ্চারিত, অকস্মাৎ বাংলায় অকশ্শাৎ অর্থাৎ শ্ম = শশঁ।

হ্ম—হ্ +ম, মূল উচ্চারণে দুই বর্ণই বিন্যাস অনুযায়ী পৃথকভাবে উচ্চারিত। ব্রাহ্মণ = 'ব্রাহ্মন', বাংলায় ব্রাম্হন্ অর্থাৎ বর্ণ বিপর্যয়— হ্ম = ম্হ!

ঞ্চ = ঞ্ + চ, মূল উচ্চারণ অনেকটা ছঁ মত, সঞ্চয় = সঙঁচয়, বাংলায় সন্চয় অর্থাৎ বাংলায় ঞ্চ = ন্চ, তেমনি 'ঞ্ছ' ও বাংলায় ন্ছ, বাঞ্ছা = বান্ছা। তেমনি ঞ্ঝ = ন্ঝ, ঝঞ্ঝা = ঝন্ঝা।

হ্ব = হ্ + ব, মূল উচ্চারণ অনেকটা ছিল হ্ওয়্। আহ্বান = আহ্ওয়ান, বাংলায় 'আওভান', অর্থাৎ হ্ব = ওভ বা উভ, বিহ্বল= বিউভল, 'বিয়হভল' নয়। অনেকেই 'আহবান', 'বিহভল' উচ্চারণ করেন, এটা ঠিক নয়, উচ্চারণ করা উচিত 'আওভান', 'বিউভল'।

য-ফলা ব-ফলাযুক্ত বর্ণ ঃ

য-ফলাযুক্ত বর্ণেও সাধারণত ওই ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। যেমন—বাক্য > বাক্কো, রৌপ্য > রৌপ্পো, অব্যয় > অব্বয়, সভ্য > সব্ভো, 'হ্য'র উচ্চারণ 'জ্ঝ। বাহ্য > বাজ্ঝো, উহ্য > উঝ্ঝো।

য-ফলা যুক্তবর্ণের পরে অ বা 'অ্যা' উচ্চারিত হয় ; অন্যায় = অন্ন্যায়, অভ্যাস = ওব্ভ্যাস, ব্যয় = ব্যায়, ব্যবস্থা = ব্যাবস্থা। ব্যথা = ব্যাথ্যা কিন্তু ব্যক্তি = বেক্তি।

আদিতে না হলে ব-ফলা যোগেও এইরকম দ্বিত্ব হয়। আদিতে দ্বার = দার, দ্বিধা = দিধা কিন্তু হরিদ্বার = হরিদ্দার আদিতে শ্বেত = শেত, কিন্তু মহাশ্বেতা = মহাশ্শেতা। স্বাগত = সাগতো, কিন্তু আস্বাদ = আস্সাদ।

যুক্ত ব্যঞ্জনগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. দ্বিত্ব যুক্ত ব্যঞ্জন এবং ২. সাধারণ যুক্ত ব্যঞ্জন।

১. দ্বিত্ব যুক্ত ব্যঞ্জন আবার দুই শ্রেণীর ঃ

১. যুক্ত বর্ণ দুটি সহজে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না। যেমন, ক্ক (ক + ক), গ্গ (গ + গ), চ্চ (চ + চ), জ্জ (জ + জ), ড্ড (ড + ড), দ্দ (দ + দ), ন্ন (ন + ন), প্প (প + প), ব্ব (ব + ব), ম্ম (ম + ম), ল্ল (ল + ল)।

২. যুক্ত বর্ণ দুটির রূপ বিকৃত হওয়ায় সহজে সনাক্ত করা যায় না। যেমন, ট্ট (ট + ট), ত্ত (ত + ত)

৩. সাধারণ যুক্ত বর্ণ ও দুই শ্রেণীর ঃ

১. সংযোজিত বর্ণগুলো সহজে সনাক্ত করা যায়। যেমন,

ক্ট (ক + ট), ঙ্খ (ঙ + খ), ঙ্ঘ (ঙ + ঘ), চ্ছ (চ + ছ), ঞ্চ (চ + ঞ), জ্জ্ব (জ + জ + ব), জ্ঝ (জ + ঝ), ঞ্ছ (ঞ + ছ), ঞ্ঝ (ঞ + ঝ), ডম (ড + ম), ড়্গ (ড় + গ), ণ্ট (ণ + ট), ণ্ঠ (ণ + ঠ), ণ্ঢ (ণ + ঢ), ত্ব (ত + ব), ত্ন (ত + ন), দ্ঘ (দ + ঘ), দ্ভ (দ + ভ), দ্র (দ + র), দ্ব (দ + ব), ন্ত (ন + ত), ন্ত্ব (ন + ত + ব), ব্দ (ব + দ), ব্ল (ব + ল), ম্ল (ম + ল), ম্প (ম + প), ল্ট (ল + ট), ল্প (ল + প), শ্চ (শ + চ), শ্ছ (শ + ছ), শ্ন (শ + ন), শ্র (শ + র), শ্ল (শ + ল), হ্ল (হ + ল), হ্ব (হ + ব)।

২. সংযোজিত বর্ণগুলোর রূপ পরিবর্তিত হওয়ায় সহজে সনাক্ত করা যায় না। যেমন,

১। ক্ত (ক + ত), ২। ক্র (ক + র), ৩। ক্ষ (ক + ষ), ৪। ক্ল (ক + ষ + ণ), ৫। ক্ষ্ম (ক + ষ + ম), ৬। গ্ধ (গ + ধ), ৭। ঙ্ক (ঙ + ক), ৮। ঙ্ক্ষ (ঙ + ক + ষ), ৯। ঙ্গ (ঙ + গ), ১০। ঙ্ম (ঙ + ম), ১১। জ্ঞ (জ + ঞ), ১২। ঞ্চ (ঞ + চ), ১৩। ঞ্জ (ঞ + জ), ১৪। ণ্ড (ণ + ড), ১৫। ত্ত (ত্ + ত), ১৬। ত্র (ত + র), ১৭। ত্ত্ব (ত + ত + ব), ১৮। থ্ব (ত + থ), ১৯। ত্ম (ত + ম), ২০। দ্ম (দ + ম), ২১। দ্য (দ + য), ২২। দ্ধ (দ + ধ), ২৩। ন্ত্র (ন + ত + র), ২৪। ন্থ (ন + থ), ২৫। ন্ধ (ন + ধ), ২৬। ন্ত্র (ন + ধ +র), ২৭। ন্ম (ন +ম), ২৮। ম্ভ্র (ম + ভ + র), ২৯। ল্ম (ল + ম), ৩০। শ্ম (শ +ম), ৩১। ষ্ক (ষ + ক), ৩২। ষ্ক্র (ষ + ক + র) ; ৩৩। ষ্ট (ষ + ট), ৩৪। ষ্ঠ (ষ + ঠ), ৩৫। ষ্ণ (ষ + ণ), ৩৬। ষ্প (ষ + প), ৩৭। ষ্ফ (ষ + ফ), ৩৮। ষ্ম (ষ + ম), ৩৯। স্ক (স + ক), ৪০। স্ক্র (স + ক + র), ৪১। স্খ (স + খ), ৪২। স্ত (স + ত), ৪৩। স্থ (স + থ), ৪৪। স্ন (স + ন), ৪৫। স্প (স + প), ৪৬। স্প্র (স + প + র), ৪৭। স্ফ (স + ফ), ৪৮। স্ম (স + ম), ৪৯। হ্ম (হ + ম),।

অনুশীলনী

১. স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে ? উদাহরণসহ লেখ।

২. স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য নির্ণয় কর।

৩. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা স্বরবর্ণগুলোকে ভাগ করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

৪. মহাপ্রাণ বর্ণ ও অল্পপ্রাণ বর্ণ কাকে বলে ? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও।

৫. ধ্বনি ও বর্ণের সংজ্ঞা লেখ এবং উদাহরণসহ এদের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

৬. যে কোন পাঁচটি বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্ণয় কর ঃ

ব, হ, স, ধ, ক, ণ, ত, ঞ, ল, র।